না জিরিয়ে নাইজিরিয়ায়

পার্থপ্রতিম ঘোষ

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। আপিস থেকে ফিরে, স্নান সেরে, সবে চা আর খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছি—হঠাৎ সেল ফোন বেজে উঠল। দেখি—মিঃ শিকদার, আমাদের সি.ই.ও। বেজার মুখে ভাবছি, হলটা কি? অসময়ে ফোন কেন?

—''আপনাকে লাগোস যেতে হবে, বাই দিস উইকএন্ড''

লাগোস। আমার মনে হল, সাহেব কি ভুল বলছেন? নিশ্চয়ই ওটা 'লাওস'। অরুণাচল অবধি দৌড়েছি বটে, কিন্তু তা বলে লাওস! ওকেবারে তিব্বত! সাহেবকে সে কথা বলতেই ধমক খেলাম।

—''না, না— আপনাকে 'লাগোস' যেতে হবে, নাইজিরিয়া। নেক্সট মঙ্গল-বুধ ওখানে মিটিং।''

সব্বোনাশ! আর জায়গা পেল না? নাইজিরিয়া সম্পর্কে আমার জ্ঞান-গম্যির দৌড় ঐ 'চিমা', 'চিবুজোর' অবধি। আর শুনেছি দেশটা নাকি ঠগ-জোচ্চরদের পীঠস্থান। কালো কালো দৈত্যের মত চেহারাগুলোর পাশে আমার নিরীহ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিরদাঁড়ায় একটা ঠান্ডা শিহরণ। পাশাপাশি আফ্রিকার বিদেশ ভ্রমণের চাপা উত্তেজনা। মনের মধ্যে এই মিশ্র চিন্তাগুলো এক নিমেষেই খেলে যাচ্ছিল। সম্বিত ফিরল সি.ই.ও সাহেবের গলার আওয়াজে। হাতে সময় নেই। আমার পাসপোর্ট ও ফটোগ্রাফ দিল্লী অফিসে। জেট গতিতে কেটে গেল চারটি দিন। 'পাওয়ার পয়েন্টে' প্রেজেন্টেশন তৈরি করা। 'হলুদ জ্বর' -এর টিকা নেবার জন্য হন্যে হয়ে খিদিরপুর মেডিকেল কলেজ আর হেস্টিংসের 'মেরিন হাউসে' ঘুরে মরা। বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের কাছে 'প্রেজেন্টেশনে'র অ্যাপ্রুভাল নেওয়া। ট্রাভেল ইনসিওরেন্স করানো, সমুদ্র আর মরুভূমি পেরোনো আট ঘন্টার লম্বা আকাশভ্রমণের কথা শুনে গিন্নির ফ্যাঁচ ফাঁচ কান্না, সেই কান্নার উপর আফ্রিকান গিল্ট-এর আশ্বাস বাণীর মলম লাগানো —এই সব কিছু সামলে অবশেষে শনিবার বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লী রওনা হলাম।

নাইজিরিয়ার সঙ্গে বর্হিবিশ্বের সংযোগ মূলতঃ 'লেগস' শহরের মাধ্যমেই। যদিও নাইজিরিয়ার রাজধানী সরে গছে 'আবুজা' শহরে। কিন্তু সেই অষ্টাদশ শতক থেকে, যখন পর্তুগীজরা প্রথম নাইজিরিয়ায় পদার্পণ করল (লেগুনের অপভ্রংশ হিসেবে 'লেগস' নামটি পুর্তগীজদেরই দেওয়া — এটা ইতিহাসে আছে), সেই তখন থেকে আজ অবধি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে 'লেগস' নাইজিরিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে জনবহুল শহর।

দিল্লী থেকে 'লেগস' দু'ভাবে যাওয়া যায়। দুবাই হয়ে, নতুবা কাতার হয়ে। সরাসরি লেগস যাবার কোন ফ্লাইট নেই। আমরা যাব দুবাই হয়ে এমিরেটসএ টিকিট বুক করা হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় দুবাই যাবার ফ্লাইট। অসিত মিধা আর আমি ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেছি সাতটায়। এমিগ্রেশন ফর্মালিটি মিটে যাবার পরেও হাতে অনেকটা সময়। উত্তেজনায় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। তার ওপর রোববারের সারাটাদিন কেটে গেছে মিধার সঙ্গে বসে আমাদের 'প্রেজেন্টেশেন' এডিট করার কাজে। চোখ একটু ভারি। কিন্তু, জিরিয়ে নেবার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি ছিল। নাইজিরিয়ার কারেন্সি হল 'নায়রা'। মিধা একটা কাজের কাজ করে নিয়েছিল। ওর এক বন্ধু, যে মাঝে মধ্যেই নাইজিরিয়ায় যায় ব্যবসার কাজে— তার কাছ থেকে ২০০ নায়রা সঙ্গে রেখেছিল। বাকিটা এয়ারপোর্ট থেকে করে নেব এমনটাই ছিল প্ল্যান। কিন্তু এয়ারপোর্টের সারি সারি ফরেন এক্সচেঞ্জ -এর নায়রা পেলাম না। বেশ অদ্ভুত লাগল। শেষমেষ, আমি আর মিধা দুজনে মিলে এস.বি.আই থেকে হাজার ডলার এক্সচেঞ্জ করে নিলাম। লেগস পৌঁছে ডলার দিয়ে নায়রা কিনে নিলেই হবে। লক্ষ্য করবার মতো একটা ব্যাপার হল — পাশাপাশি এতগুলো এক্সচেঞ্জ আউটলেট। কিন্তু, এক্সচেঞ্জ রেটগুলো সব আলাদা আলাদা। যাত্রীদের এমন কিছু ভিড়ও ছিল না ওগুলোতে। বেশি রেটে ডলার কিনলে কি পরিস্কার নোট দেবে নাকি? উত্তরটা খুঁজে পাবার আগেই ডাক পড়ল বোর্ডিং কিউতে দাঁড়ানোর।

এয়ার বাস এ-৩২০-র যাত্রী সংকুলানের ব্যবস্থা বৃহৎ। তাই, বোর্ডিং কিউটিও যথারীতি লম্বা। সামনে পিছনে তাকিয়ে যাত্রীদের ক্রস-সেকশনটা একবার মেপে নেবার চেষ্টা করলাম। মিশকালো চামড়া আর কোঁকড়া চুলের একজনও চোখে পড়ল না। বেশির ভাগই শ্যামলা আর, বাদামী চামড়ার যাত্রী। তার মধ্যে জনাদশেক শিখ পাঞ্জাবী। আর, ঐ প্রায় সমসংখ্যক সাদা চামড়ার সাহেব। দু'চারজন আরবী শেখকেও চোখে পড়ল। মুসলমানী মধ্য - প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের সংযোগ মুম্বাইতে যতটা, দিল্লীতে ততটা নয় — এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু আফ্রিকানদের ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা এরই রকম? যাত্রীদের ভিড়ে একজনও আফ্রিকানকে দেখতে না পেয়ে, ভিতরে একটা অস্বস্তি হতে লাগল। ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় গোটা আফ্রিকা মহাদেশ কি আমাদের কাছে অনেক বেশি 'বিদেশী'? হয়তো, তাই। সে কারণেই আফ্রিকা আমাদের ভারতীয় চেতনার অনেক বেশী 'এক্সটিক'। অনেক বেশী রহস্যময়। ইওরোপ বা আমেরিকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আমরা যতটা ভাবিত, তার ছিঁটেফোটাও নেই আফ্রিকা বিষয়ে। 'আফ্রিকা' নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে মনে যে ছবিটি তৈরি হয়, 'সাব-হিউম্যান', বন্য এবং বর্বর। আমাদের কাছে আফ্রিকা মানে রবিঠাকুরের কবিতা। আফ্রিকা মানে গান্ধীজির মহাত্মায় রূপান্তর পর্বের সূচনা। আফ্রিকা মানে নেলসন ম্যান্ডেলা। আফ্রিকা মানে 'উসমানস সামবেন' বা 'সুলেমান চিজে'র সিনেমা। আফ্রিকা বিষয়ে এই স্পোরাডিক সংযোগটুকুও মূলতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। অথচ, প্রত্নতত্ত্ব বলছে মনুষ্য বসতির ইতিহাস পশ্চিম আফ্রিকায় অতিপ্রাচীন। সেই ইতিহাস চলে গেছে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৯০০০/১০০০০ বছর পিছনে। পশ্চিম আফ্রিকা মানে আফ্রিকার ম্যাপের পিছন দিকের মাথার খুলির মত অংশটা জুড়ে এখনকার পাঁচটি দেশ। বেনিন, চাড়, নাইজিরিয়া, নিগার আর ক্যামেরুন। আজ জানছি মোটামুটি ১০০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ জুড়ে ঐ অঞ্চলটিতে 'হাউসা' সাম্রাজ্যের উত্থান, যা পরবর্তীকালে চলে গেল 'মালি' সাম্রাজ্যের হাতে। সাহারা অঞ্চলের সোনার খনি আর বেনিনের আশ্চর্য ব্রোঞ্জের শিল্প দিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার বানিজ্যিক উত্থানও তো ঐ সময় জুড়েই।

আমাদের গন্তব্য, 'মাথার খুলি'র ঠিক নিচের খাঁজে বিস্তৃত লেগুন আর দ্বীপ সমৃদ্ধ যে অংশটি তাকিয়ে আছে সেই 'বে অফ বেনিন' পেরিয়ে, অনন্ত অতলান্তিকের দিকে।

দিল্লী থেকে দুবাই। পৌনে তিন ঘন্টার আকাশ যাত্রা। দুবাই থেকে লেগস, আরও আট ঘন্টা। এমিরেটস-এর বিশালায়তন এয়ার

বাস টেক অফ করেছিল ভারতীয় সময় ঠিক এগারটায়। সামনের সিটে লাগান ছোট এল.সি.ডি ম্যাপটিতে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল, দেখছিলাম — আমাদের উড়ান কিভাবে ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে ডানদিকে আফগানিস্থানকে রেখে পাকিস্তানের উপর দিয়ে উড়ে 'গাল্ফ' -এর খাঁড়ি সমুদ্রের উপরে পৌঁছল। কেবল অনন্ত জলরাশি। ঐ টুকু তো খাঁড়ি সমুদ্র! তবু, পথ যেন ফুরোতে চায় না। যতবার সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়েছি, ততবারই অজানা আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠেছে। ৩০/৪০০০০ ফিট উচ্চতায় বিমানের কোনও গোলযোগ বা দুর্ঘটনা ঘটলে, নীচের স্থল বা জলের কোন ভেদাভেদই কি আর থাকে? তবু, সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে গেলে ভিতরে কেমন যে একটা বাড়তি ভয় কাজ করে! বাঙালির হৃদয় আর কাকে বলে!

এমিরেটস-এর খাবার দাবারের বন্দোবস্ত — যাকে বলে 'ফাটাফাটি'। প্রথম দফায় জমজমাট সুরা পানের আয়োজন। দ্বিতীয় দফায় ভরাট লাঞ্চ। প্রথমে 'ডে ওয়াইন', তারপর 'মাটন রোগনজোশ' দিয়ে লাঞ্চ সারবার পর, একটু তন্দ্রার রেশ কাটতে না কাটতেই দুবাই পৌঁছে গেলাম। ভারতীয় সময় বলছে ১-৪৫। সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পশ্চিমে এগোচ্ছি। তাই, দুবাইয়ের সময় পিছনে চলে। ঘড়ির কাঁটা সেই অনুসারে পিছিয়ে ১২-১২ তে রেখে দিলাম। প্রথমেই। দুবাইতে প্লেন ল্যান্ড করবার সময় জানলা দিয়ে, দেখতে পাচ্ছিলাম তাক লাগানো স্কাইলাইন। সেই সঙ্গে মানানসই দুবাইয়ের আর্ন্তজাতিক মানের এয়ারপোর্ট। ঝাঁ চকচকে, কসমোপলিটন এবং বৃহদায়তন। আপাততঃ, এই দৃষ্টি সুখেই তৃপ্ত। কারণ। সেগল -এর উড়ান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার ওপর, আমরা আধ ঘন্টা লেট।

বিমান থেকে নেমে টার্মিনাস করিডোর দিয়ে মিধা আর আমি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিলাম। লেগল গামী 'এমিরেটস' কত নম্বর গেট-এ দেবে বা দিয়েছে জানা নেই। হঠাৎ দেখি সামনে প্রায় 'ডায়ানা'র মত দেখতে এক শ্বেতাঙ্গী বিমানসেবিকা 'লেগস', 'লেগস' করে চেঁচাচ্ছে। আমি আর মিধা দাঁড়িয়ে গেলাম। একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল অনেকেই। বুঝলাম, সকলেই 'লেগস' যাত্রী।

হাতে সময় নেই। বিমান সেবিকা যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা, তার পিছনে আমরা প্রায় দৌড়োতে লাগলাম। দীর্ঘপথ হেঁটে, কখনও এস্কালেটর-এ উঠে, কখনও সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সিকিউরিটি চেকের জন্য কোমরের বেল্ট আর মোজা পর্যন্ত খুলে হাতে নিয়ে প্রায় ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে 'লেগস' গামী এয়ার বাস-এ গিয়ে বসলাম অবশেষে। এবারে কিন্তু দেখলাম গোটা এয়ারবাসটির প্রায় সত্তর শতাংস জুড়ে রয়েছে কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। অবচেতনের প্রত্যাশা যেমন মিটল, সেই সঙ্গে ভিতরে কোনও একটা 'ভিনদেশী' বোধ খোঁচাও দিতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কাও। নাইজিরিয়া সম্পর্কে জনশ্রুতি যা কিছু আছে, তার কোনোটাই ঠিক সদর্থক নয়। তবে, মিধা দেখলাম বিন্দাস আছে। আমাদের ঠিক পিছনের রো-টাতে কোনো যাত্রী আগমনের সম্ভাবনা নেই ভেবে, ও বোধ হয় একটা শুয়ে পড়ার তোড়জোড় করতে চায়। আমিও মন থেকে যাবতীয় আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। কারণ, গোটা সফরে আমরা তো 'স্পিকার' নামক কোম্পানিটির অতিথি। একা একা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা তো নেই! আবার আট ঘন্টার দীর্ঘ উড়ান। আমি পাওলো কোয়েল হো'র 'দি অ্যালকেমিস্ট' নিয়ে জানলার ধারের সিটে গুছিয়ে বসলাম।

দুবাইয়ের উড়ান গাল্ফ পেরিয়েছিল। লেগসের উড়ান পেরল 'লোহিত সাগর'। ডানদিকে মিশর আর নীলনদকে রেখে, সুদান, সাহারা মরুভূমির কিয়দংশের উপর দিয়ে উড়ে আমাদের উড়ান গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাকে পূর্ব - পশ্চিম বরাবর আড়াআড়ি অতিক্রম করল।

দুবাই এয়ারপোর্ট যতটা চমকিত করেছিল তার আয়তনে, আয়োজনে ও বৈভবে, তাকে ব্যালান্স করবার জন্যেই যে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো 'লেগস'-এর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। আই.এফ.এফ-এর ঘোষণা অনুসারে — বিশ্বের দ্রুততম অর্থনৈতিক বিকাশে, চীন ও ভারতবর্ষের পরেই নাইজিরিয়ার অবস্থান তিন নম্বরে। আর, নাইজিরিয়ার সমৃদ্ধতম নগর হল 'লেগস', যার বৃদ্ধির হার গোটা আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাধিক। তার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দৈন্যদশা ভীষণ অপ্রত্যাশিত ছিল। ভিসা চেক করা হল অত্যন্ত দায়সারা ভাবে। আমাদের লাগেজগুলো যে কনভেয়ার বেল্টে -এ বার করা হল, তার অবস্থাও জরাজীর্ণ। পরে জানতে পারলাম, এটি লেগসের পুরোন বিমানবন্দর।

বেরিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল প্রায় ৩০/৮০ ফুট উঁচু একটা পোস্টার নিচে একটি ফুটবলের ছবি। পাশে লেখা 'ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ ২০১০'। উপরে লেখা— 'ইন ২০১০, দ্য ওয়ার্ল্ড উইল বি ওয়ান। ইউ নট ওয়েট।' মুহূর্তের মধ্যে আবার মনে পড়ে গেল চিমা ওকেরি'র নাম। নাইজিরিয়া ফুটবল - পাগল দেশ। প্রসন্ন মুখে চারপাশে তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বিচিত্র মুখের ভিড়। অনেকেরই হাতে নাম লেখা বোর্ড। কিন্তু, আমাদের নাম লেখা বোর্ড কই? এয়ারপোর্টের কাছে পিঠে কোনও ফোন বুথ খুঁজে পাওয়া গেল না। মিধার মুখ চোখ দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম, সেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। লেগসে পৌঁছে বিকেলের আলোর আভাসটুকু পেয়েছিলাম। এখন অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসছে। সহযাত্রীদের ভিড়ও পাতলা হতে শুরু করেছে। মিধাকে বললাম, লাগেজ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। তুমি দ্যাখো— একটু দূরে গিয়ে কোথাও কোনও বুথ খুঁজে পাও কিনা।

১৫ মিনিট, আধ ঘন্টা কেটে গেল। মিধা ফেরে না। একের পর এক গাড়ি বেরিয়ে গেল অন্য যাত্রীদের নিয়ে। আমাদের গাড়ি পাত্তা নেই। আমাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশেপাশে কিছু নাইজিরিয় লোকজন ঘুরঘুর করছিল। একজন এসে কিছু জিগ্যেস করল। আমি প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলাম না। অন্যদিকে তাকিয়ে যেন শুনতে পাইনি, এমন একটা ভাব করতে লাগলাম। কিন্তু, বার কয়েক বলা হয়ে যাবার পর বুঝতে পারলাম, ইংলিশ বলছে। নাইজিরিয় অ্যাকসেন্ট। বোঝা খুব শক্ত। কিছুটা শুনে, আর বাকিটা আন্দাজে বুঝলাম—জানতে চাইছে, আমি কোনও গাড়ি নেব কিনা? কোনও হোটেলে- যাব কিনা? আমি কাটা কাটা ইংরিজিতে উত্তর দিলাম— ''ও সব লাগবে না। আমাদের গাড়ি আসছে।'' একটু একটু ভয় করতে শুরু করল। শুনেছিলাম নাইজিরিয়ায় স্ট্রীট ক্রাইমের প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তবু, কিছু হয়নি, এরকম একটা ভাব করে ফোনটা বার করে কথা বলার অভিনয় করে গেলাম। এই ভাবে, আর্য প্রায় আধ ঘন্টা কেটে যাবার পর, দূরে মিধাকে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসতে দেখে ধড়ে প্রাণ এল আমার। মিধা এলে বলল, গাড়ি আর ড্রাইভারকে সে খুঁজে পেয়েছে। জ্যাম দেখে, এয়ারপোর্টের পার্কিয়ে না ঢুকিয়ে গাড়ি বাইরে রেখেছিল। অবশেষে গাড়িতে বসলাম।

গাড়িটি ছিল অ্যাঞ্জি। নাইজিরিয় ড্রাইভার। নাম জন। মিশকালো গায়ের রং। গড়পড়তা নাইজিরিয়দের তুলনায় জন বেশ খর্বাকৃতি। গাড়িতে বসার পরেই স্কিপার থেকে ফোন এল জনের সেলফোনে। ওপারে যিনি ছিলেন, তাঁর নাম 'সুহেল'। মার্কেটিং

ম্যানেজার এবং গেস্ট হাইসের কেয়ারটেকারও বটে। প্রথমেই ইংলিশ ও পরে উর্দু মেশা হিন্দিতে সুহেল জানালেন যে, গেস্ট হাউস 'লেগস' - এর যে অঞ্চলে, তার নাম 'ইকেজা' এবং সেটা এয়ারপোর্ট থেকে কুড়ি মিনিটের রাস্তা। মেইন রো-এ পড়তেই দেখলাম বিরাট জ্যাম। অজস্র প্রাইভেট গাড়ির মিছিল। গাড়ির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, পেট্রোলিয়ম রপ্তানির দাক্ষিণ্যে এ দেশটির সম্পন্ন শ্রেণীর হাতে এখন অর্থের প্লাবন। পরে জানতে পেরেছিলাম— নিগার নদীর ডেলটা অঞ্চলের অয়েল রিজার্ভ গোটা বিশ্বের নিরিখে দশ নম্বরে আছে। আর তেল রপ্তানিকারী দেশ হিসেবে নাইজিরিয়ার অবস্থান গোটা বিশ্বে অষ্টম। গোটা আমেরিকায় যত তেল আমদানি করা হয়, তার ১০-১১ শতাংশ আসে নাইজিরিয়া থেকে। তাই, আমেরিকার সঙ্গে নাইজিরিয়ার সম্পর্কটাও বেশ মাখো মাখো। আমেরিকায়, নাইজিরিয় এমিগ্রেশানের হারটিও বেশ ভালই। ম্যাপে লেগসের অবস্থান দেখেছিলাম, একেবারে আটলান্টিকের ওপরে। তাই, উদ্‌গ্রীগ হয়ে ছিলাম যাবার পথে যদি আটলান্টিকের ধার ঘেঁষে যায় আমাদের গাড়ি। জনকে সেই ইচ্ছেটার কথা জানালাম, ছবি বিশ্বাসের মতো গলায়— ''জাস্ট আ গ্লিম্প্‌স অফ ইট''! কিন্তু আমার ইচ্ছেয় জল ঢেলে দিয়ে জন জানাল ওটি হবার নয়। আমরা আছি লেগস মেইন ল্যান্ড-এ। আটলান্টিক দেখতে হলে যেতে হবে লেগুন পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া আইল্যান্ডের দিকে। লেগুনের উপরের মেইন ল্যান্ড ব্রিজটি বোধ হয় বিশ্বের দীর্ঘতম ব্রীজের একটি। প্রায় ১০-১২ কিমি লম্বা। সেই ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে।

কালো মানুষের ভিড় ছাড়া ইকেজা অঞ্চলটির আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। ঠিক ভারতবর্ষেরই কোনও টাউনশিপ দেখছি মনে হল। বলবার মত ঘটনা শুধু একটি। রাস্তায় এক ক্রসিং-এ একটি পুলিশ এসে আমাদের গাড়িটাকে সহসা দাঁড় করিয়ে কাচ নামাতে বলল। জন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পুলিশটির হাতে ১০০ নায়বার একটি নোট গুঁজে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল। পরে জেনেছি, পথেঘাটে বিদেশী যাত্রীদের হেনস্থা করটা লেগস পুলিশের এক দস্তুর। এটা থেকে বাঁচবার একটাই রাস্তা। মানিব্যাগে প্রচুর খুচরো 'নায়রা' বা 'কোবো' রাখা চাই। ১০০ কোবোতে ১ নায়রা। আর, আমরা যখন নাইজিরিয়া গেছিলাম, তখন ১ ডলার মূল্য ছিল ১৫০ নায়রা। অর্থাৎ ১রুপি মানে ছিল ৩.৬ নায়রা।

স্পিকার কোম্পানির গেস্ট হাউসটি দেখবার মত। মাঝখানে বিরাট লন। তার একদিকে দারোয়ানদের থাকবার জায়গা। অন্যদিকে বিরাট বাংলো। পাশে একটি ছোট বাংলো থেকে পাজামা পাঞ্জাবী পরে ধোপ - দুরস্ত হয়ে যিনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন — তিনি মিঃ সুহেল। বিরাট প্রাসাদোপম ড্রইংরুম পেরিয়ে পাশাপাশি আমার আর মিধার থাকবার ঘর দেখিয়ে দিয়ে সুহেল বললেন — খাবার রেডি। পরদিন ভোর ৬টার ফ্লাইটে আমাদের চলে যেতে হবে আবুজায়। কারণ, আমাদের প্রেজেন্টেশন এবং মিটিং ওখানেই। ভারতবর্ষের সময় তখন রাত দেড়টা।

গরম জলে স্নান করে সারাদিনের ভ্রমণজনিত ক্লান্তি কিছুটা কাটল। বিশাল ও সজ্জিত ডাইনিং কর্ণারে বসে দেখলাম, উল্টোদিকের দেওয়ালের পাশাপাশি ঝুলছে দুটো ফোটো। প্রথমটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং-এর । আর দ্বিতীয়টি নীচে লেখা আছে 'উমারু ইয়ারাদুয়া'। সুহেল বললেন — নাইজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। মাল্টিন্যাশনাল অফিসগুলোতে নাইজিরিয়ার প্রেসিডেন্টের ছবি রাখাটা নাকি বাধ্যতামূলক।

সাদা কাপড়ে ঢাকা পেল্লায় ডাইনিং টেবিলে ফটাফট খাবার সাজিয়ে ফেলছিল দুটি নাইজিরিয় কিশোর - কিশোরী। ১৪/১৫ বছর বয়েস হবে ওদের। কিন্তু কাজের গতি আর ফিনিশ একেবারে 'গল্প হলেও সত্যি'র রবি ঘোষের মত। জিগ্যেস করলাম ওদের নাম কী। মেয়েটি বেশ স্পষ্ট ইংরিজিতেই জানাল, ওর নাম — অ্যানি, আর ওর ভাইয়ের নাম রবার্ট। বোঝা গেল প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে ব্রিটিশ কলোনি হবার সুবাদে নাইজিরিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের শিকড় বেশ ভালই ছড়িয়েছে। মিষ্টি স্বভাবের ছেলেমেয়ে দুটি, সংকোচের মধ্যেও মুখে হাসিটি লেগেই আছে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল, শিশুশ্রম কি এদেশে নিষিদ্ধ নয়? ১৫শত থেকে ১৯ শতক, নাইজিরিয়ায় ইতিহাস দাসপ্রথা ও দাস - বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেয়। ব্রিটিশদের কাছ থেকে নাইজিরিয়ার আপাতঃ স্বাধীনতা আসে ১৯৬০ সালে। কিন্তু, দাসত্বের অন্তর্লীন ধারা তো আজও বয়ে চলেছে অ্যানি-রবার্টদের মধ্যে দিয়ে।

প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল। গরম-গরম চাপাটি আর বাসমতি চাল সহযোগে নিরামিষ ভারতীয় খানা গোগ্রাসে খেতে খেতে সুহেলের কথা শুনছিলাম। বছর তিনেক হল সে লেগস -এ রয়েছে। তার গোটা পরিবার আগ্রাতে। বুঝলাম, শুধু মাত্র রোজগারের তাগিদে সে বাড়ি ছেড়ে প্রত্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকায় পড়ে আছে। চোখে মুখে একটা এলিয়েনেশন জনিত ক্লান্তির ছাপও বেশ স্পষ্ট।

সুহেল বেশ গর্বের সঙ্গে জানাল, গত এক বছর ধরে অ্যানি আর রবার্টকে ভারতীয় রান্না শেখাবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তারই।

লেগসে পৌঁছোবার আগে মিধার কাছে শুনেছিলাম নাইজিরিয়ার স্বীকৃত প্রধান সংযোগ ভাষা ইংরিজি। সুহেল কিছু নতুন তথ্য দিল। নাইজিরিয়ার এথনিক ভাষার সংখ্যা নাকি ৫০০-রও বেশি। একটি ভাষার নাম 'কাবুরি'। নাইজিরিয়ার তিনটি প্রধান এথনিক গ্রুপের নাম ইয়োরুবা, ইগবো আর হাউসা। এদের ভাষা নাকি আলাদা আলাদা। এ থেকে বোঝা যায়— আমাদের বিশ্ববোধজনিত জ্ঞানভাণ্ডার কতটা নগরকেন্দ্রিক। শুধু শহর দিয়ে একটি দেশকে বোঝার, জানার এই রীতি, অর্ধসত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু ভাষা নয়। খ্রীষ্ট ও ইসলাম এই দুই ধর্মের বাইরে এখনও পালিত হয় ট্রাডিশনাল অনেক ধর্ম।

লেগসে আমাদের প্রথম রাত্রি, নিশ্চিন্ত ঘুমের হল না। কারণ, পরদিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়তে হল আবুজার উদ্দেশ্যে। লেগস থেকে আবুজার দুরত্ব সাড়ে পাঁচশ কিলোমিটার। প্রায় সোয়া এক ঘন্টা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বনানীর শোভা দেখতে দেখতে আমরা 'আবুজা সিটি গেট' দিয়ে যখন শহরের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম, তখন দূরের সুন্দর সিটি স্কাইলাইন বলে দিচ্ছিল, এই শহর নবজাত এবং পরিকল্পিত। লেগসের নোংরাও বিশৃঙ্খল রাস্তাঘাট, বাড়িঘর এবং প্রবল জন - বিস্ফোরণের ঠিক উল্টো চিত্র আবুজায়। প্রতিটি বাড়ির স্থাপত্যসৌন্দর্য্য মন কেড়ে নেয়। পরে জানলাম মাত্র আঠারো বছর আগে, ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে আবুজাকে সরকারিভাবে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নাইজিরিয়ার ৩৬টি রাজ্যের উপরে, আবুজা হল একটি 'ফেডারাল ক্যাপিটাল টেরিটরি।'

আবুজায় স্কিপারের গেস্ট হাউসটির অবস্থান যে অঞ্চলে, তার নাম 'আসকোরো'। সুন্দর ডুপ্লেক্স বাংলোয় ভর্তি ঐ এলাকাটি। ঐরকমই একটি বাংলোয় ঢুকে মুখোমুখি হলাম আবুজায় স্কিপার অফিসের কর্ণধার শ্রী রাজীব দুগ্গলের। লেগস থেকে মিঃ বনশলও এসে পৌঁছেছিলেন আগের দিন রাত্রে। পরপর দুটো দিনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটে গেল কাজে। কাজ করতে গিয়ে সরকারি অফিসের অন্দরমহলের চেহারা দেখে কিন্তু মনে হল নাইজিরিয়া ভারতবর্ষেরই নিকট আত্মীয়। একই রকম খোলামেলা। একই রকম শৃঙ্খলাবোধের

অভাব। স্যুট প্যান্টের পাশাপাশি নাইজিরিয়ার জাতীয় পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবী পরেও অফিস করা যাচ্ছে। সারাদিনের কাজের ফাঁকে যতটুক সময় পাওয়া গেল, সেটির সদ্ব্যবহার করে দুগ্গল আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন আবুজা শহর। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট ও সৌধের নকশা করেছেন ইতালি আর জাপানের স্থপতিরা। ঘুরে ঘুরে দেখা হল মিলেনিয়াম পার্ক, নির্মীয়মাণ মিলেনিয়াম টাওয়ার, ন্যাশনাল মঞ্চ-এর সোনালি সৌধ, ন্যাশনাল চার্চ, স্পেস রিসার্চ সেন্টার। হিল্টন হোটেলে লাঞ্চ খাওয়ালেন দুগ্গল। অন্য কন্টিনেন্টাল ডিশের সঙ্গে টেস্ট করবার জন্য এক প্লেট নাইজিরিয়ান বিরিয়ানি নেওয়া হয়েছিল। যদিও প্রবল মশলাদার হওয়ায় আমাদের বাঙালি পিলেয় সইল না।

আবুজায় দুদিনের ঝটিকা সফর সেরে পরদিন সকাল ন'টার ফ্লাইটে আবার ব্যাক টু লেগস। কিন্তু জিরোবার জো নেই। এয়ারপোর্ট থেকে স্কিপারের গাড়ি আমাদের তুলে নিয়ে সোজা চলল শহরের বাইরে, 'ইকোরোডু' নামক এক জায়গায়, যেখান স্কিপারের নাইজিরিয় ওয়র্কশপ। প্রায় চল্লিশ কিমি লম্বা রাস্তা। মাঝখানে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বস্তি এলাকা পার হতে হল। সেই বস্তির নোংরা ও করুণ দৃশ্য আমাদের পিলখানা বস্তিকেও হার মানাবে। আর, সেই বস্তি এলাকায় দেখলাম আমাদের শুঁটকি মাছের স্টাইলে মাংস শুকোন হচ্ছে। ড্রাইভার জন জানাল, নাইজিরিয়ান গরিব মানুষেরা কুকুরের মাংস খেতেও অভ্যস্ত। আবুজা বা লেগসে, কোথাও কোনও জন্তু জানোয়ার বা পাখি চোখে পড়ল না। ভারি অদ্ভুত। নাইজিরিয় সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য মশলাদার মাংস আর সাইড ডিশ হিসেবে মেটে আলু সেদ্ধ। কিন্তু, এরা নাকি মিষ্টি একেবারেই খায় না। পথেঘাটে জন্তু জানোয়ারের অভাব কি সেই কারণেই?

ইকোরোডুতে সারাদিনের কাজের শেষে বিকেলবেলা ফিরলাম লেগুনের ওপর ১০ কিমি লম্বা ব্রিজ দিয়ে। ব্রিজের ওপর দিয়ে যেতে যতে দূরে লেগুনের ওপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো টাওয়ারগুলো যেন নাইজিরিয়ার উদীয়মান অর্থবৈভবের প্রতীক। সকালে দেখা বস্তির জীর্ণ ও দীন চেহারা, আর শেষ বিকেলের অস্তমিত সূর্যের আলোয় লেগসের এই বৈভব খুবই বিসদৃশ রকমের আলাদা। মুখচ্ছবির এই বৈপরীত্য সর্বদেশে সর্বকালে অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

দ্বিতীয় দিনটিতে আমাদের চলে যেতে হয়েছিল আবেকোটা। লেগস শহর থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৮০-৯০ কিমি। শহর থেকে বেরিয়ে আবেকোটা যাবার গোটা রাস্তাটি বড়ো মনোরম। মাইলের পর মাইল জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত বনানী।

তৃতীয় এবং শেষ দিনটিতে কোনো কাজ ছিল না। গোটা দিনটি আমাদের বরাদ্দ ছিল আটলান্টিকের জন্যে। ইকোরোডুবে গিয়ে দৈবাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল এক বঙ্গ সন্তানের সঙ্গে। মেদিনীপুরের যুবক। ৩২-৩৩ বছর বয়েস। নাম, প্রদীপ মাইতি। প্রদীপ এবং তার সহকর্মী সুরেশ খান্ডা আমাদের সঙ্গী হল। সকাল সাড়ে ন'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম ভিক্টোরিয়া আইল্যান্ডের দিকে, যার অপর নাম 'লেক্কি পেনিনসুলা।' যাবার পথে, ইকেজার যে অংশটায় প্রচুর ভারতীয়র বাস, সেখানকার একটি রেস্তোরাঁ থেকে রোস্ট, কাবার, স্যান্ডউইচ আর আট বোতল বিয়ার কেনা হল। 'লেক্কি পেনিনসুলা' —সরু, লম্বা এক ফালি দ্বীপ, যার একদিকে লেক্কি লেগুন অন্য দিকে গাঢ় নীল আটলান্টিক। যদিও নীচের লাগোয়া সমুদ্রের ভৌগোলিক নাম 'গাল্ফ অফ গিনি', তাতে, অনন্ত অতলান্তিকের মাহাত্ম্য এতটুকু খর্ব হয় না।

সারাটা দিন কেটে গেল, গল্পে - গুজবে, আটলান্টিকের নোনা বাতাস বুকে নিয়ে। আর সমুদ্রে জলকেলিরত নাইজিরিয় যুবক-যুবতীদের দিকে তাকিয়ে। ফেরার পথে, হঠাৎ খেয়াল হল গিন্নিকে কথা দিয়েছিলমা, একটি উপহার নিয়ে যাব। পেয়েও গেলাম। চমৎকার একটি কাঠের মুখোশ। যার মধ্যে এথনিক নাইজিরিয়ার ছাপ রয়ে গেছে। প্রদীপ বলল, এটার নাম 'রয়াল বিনি মাস্ক'।

সন্ধেবেলায়, গেস্ট হাউসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে, করমর্দন করে বিদায় নিল প্রদীপ আর সুরেশ। উজ্জ্বল দুই যুবক, একটি দিনের সুহৃদ হয়ে যারা আমার মনে থেকে গেল চিরকাল। আর হয়তো দেখাই হবে না কোনও দিন।

রাত সাড়ে আটটায় লেগস থেকে দুবাই ফিরে যাবার ফ্লাইট। সাতটার সময় সুহেল আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল নতুন ঝাঁ চকচকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। 'মুরতালা মহাম্মদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট'। নাইজিরিয়ার প্রথম মিলিটারি প্রধানের নামে নামাঙ্কিত। স্বাধীনতা পরবর্তী নাইজিরিয়ার দীর্ঘ ইতিহাস, এক মিলিটারি শাসনের ইতিহাস। এক শোষণের, আর অপশাসনেরও ইতিহাস। এই দীর্ঘ অপশাসন, নাইজিরিয়াকে দিয়ে গেছে সর্বব্যাপী দুর্নীতির এক অমোচনীয় কলঙ্ক। গণতন্ত্রের নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়েছে নাইজিরিয়ায়। এই অধ্যায় কি মুছে দিতে পারবে কলঙ্কের এই দাগ?

মনে পড়ে গেল অ্যানি, রবার্ট আর জনদের হাস্যময় সরল মুখগুলো। উল্টোদিকের রাস্তায় আবার চোখে পড়ল ৩০ ফুট উঁচু সেই পোস্টার।'

ইন ২০১০, ওয়ার্ল্ড উইল বি ওয়ান।

উই ক্যান নট ওয়েট।

মনে মনে একটা কুর্ণিশ ঠুকে ঢুকে পড়লাম এয়ারপোর্টের উজ্জ্বল আলোকসরণীতে।